এখনও বিশ্বাসও করি, বামপন্থাই বিকল্প

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলার বন্ধু বেণুর কথা খুব মনে পড়ে আজকাল। এই অস্থির সময়ে ওর মুখ বেশি ভাসে চোখে। কৃষ্ণনগরে এক পাড়ায় থাকতাম। আমার ফজলু কাকার ছেলে বেণু। বেণু রহমান। বেণু হিন্দুর থেকেও বেশি হিন্দু ছিল। ওঁর নিয়মকানুন মানার ঠেলায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে যেতাম। আবার আমায় বলত, পুলু তুমি এ সব একটু মানো। আমি ধমক দিতাম ওকে। মনে পড়ে রূপচাঁদ জেঠুর (রূপচাঁদ তপাদার) কথা। দুর্গাপুজোয় বাড়ি গিয়ে কেন দেখা করলাম না, সে জন্য জেঠুর সে কী বকুনি! জেঠু ছিলেন খ্রিস্টান।

বাড়িতে বড়রা এলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাই রেওয়াজ ছিল। বাবার বন্ধুরা এলেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম। কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে খ্রিস্টান– ওসব কোনও বাছবিচার ছিল না। ছেলেবেলায় সাম্প্রদায়িকতা শব্দটা শুনিনি এমন নয়। তবে আর পাঁচটা শব্দের মতোই আমাদের কাছে সাধারণ এক শব্দ ছিল মাত্র। কোনও বিশেষত্ব ছিল না। ফলে মাথায় গেঁথে যায়নি। বা গেঁথে যাওয়ার মতো পরিবেশও তৈরি করা হয়নি তখন। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় নদীয়া জেলার কোথাওই কোনও প্রভাব পড়েনি। কৃষ্ণনগরেও না। এখন সত্যিই খুব হতাশ লাগে। আমার চেনা দেশ এখন কোন অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আদৌ সেই অন্ধকার কাটিয়ে উঠতে পারবে কি না জানি না। আমি চেনা ছন্দে আমার দেশকে আর দেখতে পাব কি না, তা-ও জানি না।

ছেচল্লিশে আমি অনেকটাই ছোট। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, সে সব বোঝার বয়স আমার তখনও হয়নি। কলেজে ঢুকে যাওয়ার পর আর হিন্দু-মুসলমান বলে আমাদের কাছে আলাদা কিছু ছিল না। একটা বিষয় আমায় বরাবরই খুব নাড়া দেয়, জিন্নার 'কল ফর পাকিস্তান' মুসলমানদের অধিকাংশকে এতটা আকর্ষণ করতে পেরেছিল কেন? তীব্রভাবে মনে হয়, তখন বেশিরভাগ জমিদারই ছিলেন হিন্দু আর প্রজারা মূলত মুসলিম। ফলে নিপীড়িত হয়েছেন তাঁরাই। তখন ভেবেছিলেন, পৃথক রাষ্ট্র হলে এই সমস্যাগুলি মিটবে। পাকিস্তানে হিন্দু শাসন বা হিন্দু পীড়নের প্রশ্ন থাকবে না। কিন্তু পরে প্রমাণ হয়েছে, এই ধারণা আদপে কত ভুল। তাই আরেকবার মুক্তির লড়াই করে '৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হয়েছিল।

আজ আশ্চর্য হই, যে শত সহস্র উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলা থেকে এসেছেন, তাঁদের তো মুসলমানদের উপর রাগ আছেই, কিন্তু এখন এপার বাংলার মানুষদের যেন মুসলিমদের উপর রাগ আরও বেশি। পূব বাংলা থেকে আসা মানুষদের রাগের মধ্যে অভিমানও যেমন আছে, ভালোবাসাও আছে। একসঙ্গে থাকতেন। ছেড়ে আসতে হয়েছে। সেই অনুভূতি আছে। আবার

মুসলমানরা যেমন তাঁদের উপর হামলা চালিয়েছে, তেমনই রুখেও দাঁড়িয়েছে— এমন ইতিহাসও আছে। ফলে ওপার বাংলা থেকে চলে আসা মানুষদের কাছে প্রতিক্রিয়াটি মিশ্র। কিন্তু এবারকার যে প্রজন্ম সে সব দিন দেখেনি, শুধু গল্পই শুনেছে, তাঁদের মধ্যে উগ্রতা যেন বেশি। কিংবা উগ্রতা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের বাড়ির দুর্গাপুজোয় কোনও ধর্মের ভেদাভেদ ছিল না। পাড়া-প্রতিবেশী, গিন্নি যে ধর্মেরই হোক না কেন, আমাদের বাড়ির পুজোয় আসতেন। অংশ নিতেন। তবে একটা জিনিস খুব চোখে পড়ত, মুসলিমরা যত হিন্দুদের বাড়ি যেতেন, হিন্দুরা তত যেতেন না মুসলমানদের বাড়ি। সে দিক থেকে আমি বলব, হিন্দুরা অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক। এখন তারই উগ্র চেহারা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বাড়িতে এমনিতেই ধর্মবিরোধী মনোভাব ছিল।

ভাবলে অবাক লাগে, যাঁর আমলে ২০০২ সালে গুজরাটে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হলো, সেই তিনিই আজ ভারতবর্ষের মসনদে। ভারতবর্ষের মানুষ এদের সহ্য করছেন। তাঁদেরই ভোট দিয়ে আবার জেতাচ্ছেন। তার একটা বড় কারণ আমার মনে হয়, মানুষ শক্তিশালী কোনও বিকল্প পাচ্ছেন না। বা বুঝে উঠতেই পারছেন না। মহামারীতে এত মানুষ আক্রান্ত, এত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, এককথায় দুঃসহনীয়। তার মধ্যেও রামের নামে চলছে রাজনীতি। মজার বিষয় হলো, যে রামের নামে মন্দির তৈরি হলো, সেই রামকে কিন্তু আমরা সকলেই ছেলেবেলা থেকে চিনি, জানি। শত সহস্র বছর ধরে রাম একইরকম জনপ্রিয়। রাম আমাদের চোখের সামনেই থাকেন। ভালোবাসা, অনুপ্রেরণার জায়গা। একটা কথা বলতে পারি। যে রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে যান, সেই রাম কি এই বিপুল বৈভবের মন্দিরে থাকতেন? পিতৃসত্য পালন, বনবাস সবই যদিও কল্পকথা। এগুলি আসলে আমাদের জীবনে মূল্যবোধ তৈরি করে। মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে থাকে। কিন্তু সেই মূল্যবোধগুলো আসলে কোথায়? আমাদের সংস্কৃতিকেই আমরা অবহেলা করছি। আঁকড়ে ধরিনি ঠিকমতো।

আমার বিশ্বাস, বিকল্প কেউ হতে পারলে তা বামপন্থীরাই হতে পারেন। কিন্তু সেই দৃঢ়তা কোথায়? মানুষের মনে ভরসা তৈরি করতে পারছেন কোথায়? এই সময়েই খুব হতাশ হয়ে পড়ি। এই দেশ, এই সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, বুঝতেই পারছি না। বিশ্বজুড়েই দক্ষিণপন্থার উত্থান ঘটছে। সব দেশের কথা বিস্তারিত জানি না। কিন্তু প্রশাসন চোখ বুজে না থাকলে এই অনাচার হতে পারে না কোথাও। এর প্রতিকার কীভাবে, সেটাই আমার জিজ্ঞাসা।

ধর্মের প্রভাব সব দেশের সব অংশের মানুষের মধ্যেই কম-বেশি আছে। কিন্তু ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরবে ধর্মের গোঁড়ামি অত্যন্ত বেশি। সৌদি আরবের একজন মানুষকে বোঝানো খুব কষ্টকর যে, মুসলমান হওয়াই জীবনের সব নয়। আবার ভারতেও হাতে গোনা কয়েক জনকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বোঝানো যায়। অধিকাংশই বুঝতে চান না। রামকে নিয়ে এই জায়গাতেই রাজনীতি চলছে। রাম যেহেতু প্রত্যেকের কাছেই এক অনুভবের ও ভালোবাসার জায়গায় আছেন, তাই হিন্দুত্ববাদীরা রামকেই ধরেছে নিজেদের সাম্প্রদায়িক অ্যাজেন্ডা পূরণের জন্য। ওঁরা জানেন, রামকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হলেও কেউ বাধা দেবেন না। কারণ অধিকাংশই মনে করেন, রাম তো আমাদের নিজের লোক। আমি তো রামেরই ভক্ত। অত্যন্ত ধূরন্ধর মতলববাজ রাজনীতিকরা এ সব করে চলেছেন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর যেভাবে বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে, তা অত্যন্ত সংগঠিতভাবে। তাদের বিরুদ্ধে দেশে কী হয়েছে? যে রাজনৈতিক দলগুলি এতে বাধা দিতে পারত, তারা কোথায় ছিল? আমি বারবার সেই প্রশ্ন তুলব। মুখে বললেই হবে না। তাদের পতাকার তলায় লোককে জমায়েত করতে পারছে?

ভারতবর্ষের প্রকৃত চেহারা তো স্কুলের পাঠ্যবই থেকে পেয়েছি আমরা। হিটলারের সময়ের জার্মানির সঙ্গে অনেকেই আজকের ভারতের তুলনা টানেন।

কিন্তু আমি কিছুতেই সেই তুলনা করতে পারি না। অন্তত শিল্পোন্নত দেশ জার্মানি, আর আমাদের দেশ একেবারেই বেনিয়াদের। তার মধ্যে কোনও তুলনা হয় না কি? তাদের বিশ্বজয়ের দরকার ছিল, তা না হলে মাল বেচতে পারবে না। কিন্তু তাদের কার্যকলাপ এতই অমানবিক ছিল যে, পৃথিবীর মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমাদের দেশে এখন গোসেবক-গোরক্ষক এই সব নাম দিয়ে কাণ্ডকারখানা চলছে। গোমূত্র পান করলে করোনা সেরে যাবে, থালা বাজালে, বাতি জ্বালালে করোনা চলে যাবে, এগুলো ঘৃণ্য অ্যাজেন্ডা ছাড়া আর কিছু না। এই ভারতের আছে কি থালা বাজানো ছাড়া? তার আবার জার্মানির সঙ্গে তুলনা! অন্যের পিছন ধরে চলে। আর কাগজে লেখা হয়, ভারত একটা বিশাল ব্যাপার। বিশাল শক্তিশালী দেশ। কীসের জোরে এই কথাগুলি বলা হয়? নিজের তো কোনও জোরই নেই। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এখন চীনবিরোধী কাজ চলছে। যা বলা হচ্ছে, প্রতিটি কথা চ্যালেঞ্জ করা যায়। চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে? আমেরিকা বা অন্য দেশ পাশে এসে না দাঁড়ালে ক্ষমতা আছে যুদ্ধ করার? চীনের দ্রব্য বর্জন তো আমাদের দেশের অর্থনীতিতে আরও প্রভাব ফেলছে। চীনের জিনিস কেনা বন্ধ হলে তো আমেরিকার জিনিস কেনাও বন্ধ করা উচিত। আমি বলব, চীন অতি নরমভাবেই দেখছে গোটা বিষয়টি।

৬০ বছর ধরে কংগ্রেস দেশ চালিয়েছে। কংগ্রেসের অনেক নেতাই দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন। প্রকাশ্যে নয় ঠিকই, গোপনে। ইতিহাস খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। আমার মতে, বামপন্থীদের মূল্যায়নেও অনেক ঘাটতি থেকে গিয়েছে। গান্ধীজীর সঙ্গে আমাদের মতের অমিল ছিল বা আছেও। কিন্তু তাঁর রাজনীতির মধ্যে যে সততা ছিল, তা অস্বীকার করার নয়। আজকের রাজনীতিকদের ক'জনের আছে সেই সততা? এখন তা নতুন করে ভাবাচ্ছে। বামপন্থীরা তখন বলতে পারতেন তো, গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ আছে। এইটুকু বলার জায়গা থাকবে না? গান্ধীজী কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে কোনও আপস করেননি। ঘোর হিন্দু হয়েও তিনি মুসলিম-বিরোধী কাজকর্ম করেছেন, এ কথা কেউ বলতে পারবে না। ভারতবর্ষকে তিনি চিনতেন তাঁর মতো করেই। জওহরলাল নেহরুর কথাও বলতে হবে এ প্রসঙ্গে। অন্য অনেক বিষয়ে বিরক্তি থাকলেও এ কথা বলতেই হবে, নেহরুও কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে কোনও আপস করেননি। আমি অন্তত সুভাষচন্দ্র বসুর থেকে বড় ধর্মনিরপেক্ষ কাউকে মনে করি না। ওঁর আইএনএ-র গঠন, কাজকর্ম দেখলে বোঝা যায়। আবার সুভাষ বসুর কাছেও ভারতের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কিন্তু গান্ধীই।

গান-বাজনার জগতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কদর কমে যাওয়াকে আমি দুর্ঘটনা বলে মনে করি। যাঁরা চর্চা করতেন, তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে হয় তো হিন্দু বা মুসলিম। কিন্তু আসলে তাঁরা শিল্পী। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এক মারাঠি ব্রাহ্মণ, নাম ভাস্কর বুয়া। তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতে গেলেন আগ্রায়। সেখানে তো সব তাবড় তাবড় ওস্তাদরা থাকেন। তেমনই এক ওস্তাদজীর কাছে নাড়া বাঁধলেন। তো সেই ওস্তাদজী ভাস্কর বুয়াকে দিয়ে এক বছর ধরে শুধু গাড়ুতে জলই ভরাতেন। কতটা 'দিল' লাগিয়েছ, তার পরীক্ষা। কতটা ধৈর্য, কতটা সহ্যশক্তি, সে সবও পরীক্ষা করতেন। আগে দীক্ষা, তারপর শিক্ষা, তারপর পরীক্ষা। এক বছর ওভাবে ছিলেন বুয়া। একবারও ওস্তাদজী বলেননি, অমুক দিন থেকে শেখাব কিছু। একদিন বুয়া ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, হঠাৎ ওস্তাদজী বললেন, আমার খুব মাংস খেতে ইচ্ছে করছে। মাংস নিয়ে আয় তো। মারাঠি ব্রাহ্মণ হয়ে মাংস কিনতে যেতে হবে– ভেবে তো কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন ভাস্কর বুয়া। কেউ দেখলে আর রক্ষে নেই। ওস্তাদজী বললেন, তুই এটুকু করতে পারবি না। তাহলে বাড়ি চলে যা। তোর আর তালিম নিয়ে কাজ নেই। উপায় না দেখে ভাস্কর বুয়া গেলেন মাংস কিনতে। ওস্তাদজীর পায়ের সামনে রাখতেই তিনি বললেন, রান্না করতে হবে। কড়াইয়ে মাংস চাপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভাস্কর বুয়ার তখন এমনই অবস্থা যে, প্রায় উনুনের উপরই পড়ে যাবেন। শেষে ওস্তাদজী বললেন, কাল থেকে তোকে তালিম দেব।

আর আজ এই যে গোরু খাওয়া নিয়ে যা চলছে, কী প্রচণ্ড রাগ হয় বলে বোঝাতে পারব না। এত সস্তায় এই হাই প্রোটিন কোথায় পাওয়া যাবে? গোটা বিশ্ব গোরু খায়। সবচেয়ে বড় কথা, কে কী খাবে না খাবে– তুমি (পড়ুন উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা) বলে দেওয়ার কে? গোমাংস ভক্ষণে কোনও হিন্দুর আপত্তি থাকতেই পারে। কিন্তু সেই আপত্তি অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে কেন? কে কী খাবে, তা-ও তুমি বলে দেবে! এ কোথায় নামছি আমরা! গো-মাংসের ছুতো করে মুসলমান মারা হচ্ছে। এই ছবি আগে ছিল না ভারতবর্ষের। আমাদের দেশ কী, দেশের ভিত্তি কী, সেই চেহারা তো পাঠ্যবই থেকেই জেনেছি।

মোদী যখন রামমন্দিরের ভিতপুজো করলেন, সে দিন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা নিয়ে খুব চর্চা শুরু হয়েছে, 'দীনদান'। আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বচ্ছন্দ নই। লোকমুখে শোনা। পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ সব সময়েই ভীষণ প্রাসঙ্গিক। এ কথা অস্বীকার করার নয়। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যদি জমিদার পরিবারের সন্তান না হতেন, জমিদারি সামলাতে রবীন্দ্রনাথকে যদি গাঁয়ে-গঞ্জে যেতে না হতো, তাহলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই হতেন না। যুগ-যুগ ধরে ওঁর প্রাসঙ্গিকতা বিরাজ করত না। বাংলাদেশের মানুষকে এভাবে ভালোইবাসতে পারতেন না, যদি না তিনি জমিদারি সামলাতে যেতেন। শিলাইদহে গিয়ে ওঁর চোখ খুলে যায়। শহরের ছেলে হয়ে থাকলে চিনতেন কী করে দেশকে! দেশের জল-মাটি অনুভব করতেন কী করে! ভাবলেন, এই আমার দেশ। এখানে এত সমস্যা মানুষের! ব্রাহ্মবাড়ির ছেলে হওয়ায় ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি কখনওই ছিল না রবীন্দ্রনাথের। হিন্দুদের সঙ্গে বরং অনেক অমিলই ছিল। সেই সঙ্গে অবশ্যই ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব বড় কথা। মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করতে ইতালি চলে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু রোমা রোলাঁদের বকাবকিতে নিজের ভুলও বুঝেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কথা বলব। তিনি নিজে সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়েও বেদ-বেদান্তের থেকে ইংরেজি সাহিত্য, বেকন পড়ানোর উপরই জোর দিয়েছেন।

শেষে বলব, গোঁড়ামি তৈরি করতেই চালাকি করে ধর্ম আর রাজনীতি মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কে রামকে ভালোবাসল, কে রহিমকে– তা কোনও ব্যাপারই হতে পারে না। তাই বার বার মনে হয়, এসবের বিকল্প হতে পারে একমাত্র বামপন্থাই।

অনুলিখন : সঞ্চারী চট্টোপাধ্যায়